Global Environment

[সিলেবাস: Environmental issues challenges, climate change, global warming, climate adaptation, climate diplomacy]

অনুসরণীয়: এই অধ্যায়টি তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ। তবে Loss & Damage, COP-27, SDGs & Climate Diplomacy বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত প্রশ্ন:

৪১তম: চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতাগুলো কী কী? [***]

আবহাওয়া যখন তার স্বাভাবিক প্রকৃতি পরিবর্তন করে চরম ও বিরূপ আকার ধারণ করে তখন তাকে চরম আবহাওয়া বলে। চরম আবহাওয়ার পিছনে জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করা হয়।

আবহাওয়াবিদদের মতে চরম আবহাওয়ায় মূলত অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক, মারাত্মক ও অসময়ের আবহাওয়া বিরাজমান থাকে যা পূর্বে দৃশ্যমান ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তীব্র গরম, খরা, বন্যা ও অতিবৃষ্টি বিরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানল heat dome দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে কোথাও কোথাও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, তুষারঝড় হচ্ছে। চীন-ভারত-নেপাল-পাকিস্তানে আকস্মিক বন্যা-ভূমিধস, ভারতের কেরালা-মহারাষ্ট্রে প্রলয়ংকারী বন্যা, সৌদি আরবে আকস্মিক অতিবৃষ্টি-বন্যা ছাড়াও মরুদেশটিতে তুষারপাত হয়েছে।

চরম আবহাওয়ার ভয়াবহ প্রভাব: [***]

০১. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি:** বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এতে এসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার লাখ লাখ লোক 'পরিবেশগত উদ্বাস্তু'তে পরিণত হবে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইনে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বসবাস করে।

০২. **তীব্র তাপদাহের প্রবণতা:** ২০২৩ এ চীনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। অপরদিকে যুক্তরাজ্যের তাপমাত্রা ইতিহাসে প্রথমবারের মত ৪০ ডিগ্রিতে উঠে যায়।

০৩. **বাড়ছে খরা:** তাপদাহ যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খরা। তীব্র গরমে যখন বৃষ্টির দেখা মেলে না, মাটি হারায় আর্দ্রতা, দেখা দেয় পানির অভাব। পূর্ব আফ্রিকায় খরার প্রভাবে দুর্ভিক্ষ ও মানব বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

০৪. **বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়:** চরম আবহাওয়ার কারণে ঘন ঘন, দীর্ঘমেয়াদি ও রেকর্ড ভঙ্গকারী বন্যা সংঘটিত হচ্ছে। চরম আবহাওয়ার ফলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় যেমন: হারিকেন, টাইফুন বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় সৃষ্টি হয়।

০৫. **দাবানল:** জলবায়ু বদলের কারণে যে চরম গরম আবহাওয়া চলছে, তা মাটি ও গাছপালা থেকে আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে। এই শুকনো দশা বনে আগুনের রসদ যোগায়। ২০২৩ সালে কানাডা, এমনকি উত্তর আমেরিকার ইতিহাস সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল দেখা যায়।

০৬. **অতিবৃষ্টি:** আবহাওয়া যত উষ্ণ হবে, জলীয়বাষ্প ততই বাড়বে। তাতে ভারি বৃষ্টি বাড়বে। ব্রিসবেনে বছরে যা বৃষ্টি হয়, তার ৮০ শতাংশ হয়ে গেছে মোটে ৬ দিনে। সিডনিতে বছরের গড় বৃষ্টিপাতেরও বেশি বৃষ্টি হয়ে গেছে ৩ মাসেই।

০৭. **আর্থিক ক্ষতি:** গরম আবহাওয়ার কারণে ২০২৩ সালে অতিরিক্ত গড়নের কারনে বিশ্ব জিডিপি'র ০.৬ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। [সূত্র: Green central Banking]

০৮. **খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস:** ১ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়ার কারণে বিশ্বব্যাপী গম উৎপাদন ৬% এবং ধান উৎপাদন ১০% হ্রাস পেয়েছে বলা হয়েছে ল্যানসেটের গবেষণায়।

০৯. **প্রাণী জগতে বিরূপ প্রভাব:** বরফ গলতে থাকায় Polar Bear বা উত্তর মেরুর শ্বেত ভালুকের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি আটলান্টিক মহাসাগরের স্যামন মাছ বিপন্ন হবে। কারণ যেসব নদীতে ঢুকে তারা ডিম পেড়ে বাচ্চার জন্ম দেয়, সেগুলোর পানি গরম হয়ে যাচ্ছে।

৪০তম: জলবায়ু শরণার্থী (Climate refugee) বলতে কী বোঝায়? [***]

ভপরিবেশ বিশারদ ও গবেষক Myers & Kent সংজ্ঞায়িত করেন যে,

> "যেসব লোক কোনো স্বাভাবিক পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে তাদের ঐতিহ্যগত বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় এবং নিরাপদ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, তারাই পরিবেশগত শরণার্থী।"

জলবায়ু শরণার্থী ৩ ভাবে হয়ে থাকে–

১. মরুকরণ প্রক্রিয়ায় যারা বাস্তুচ্যুত হবে।
২. সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হবে।
৩. পরিবেশগত সংঘাতের কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হবে।

জলবায়ু গবেষক Sukrhe এর মতে জলবায়ু শরণার্থী সৃষ্টির কারণ:

ক. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি খ. মরুকরণ গ. খরা
ঘ. ভূমিক্ষয় ঙ. পানি চ. বায়ুদূষণ

২০২১ সালের IPCC এর Sixth Assessment Report -এ বলা হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে ২০৫০ সাল নাগাদ ৪ কোটি জলবায়ু শরণার্থী হবে।

৩৭তমঃ কপ (COP) ২২ মূল সিদ্ধান্তগুলি কী কী?

উত্তরঃ এখন দরকার নেই [কপ-২৭ জানতে হবে]

সিলেবাস অনুযায়ী এই অধ্যায়ের বিষয়সমূহ

➢ জলবায়ু পরিবর্তন [**]

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যতম আলোচিত একটি ইস্যু। প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে মানুষের জীবনযাত্রার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। জীবন ও পরিবেশের এই সম্পর্ক এক ও অভিন্ন। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার এক গুরুতর উৎকণ্ঠার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘদিনের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যালোচনা করে জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

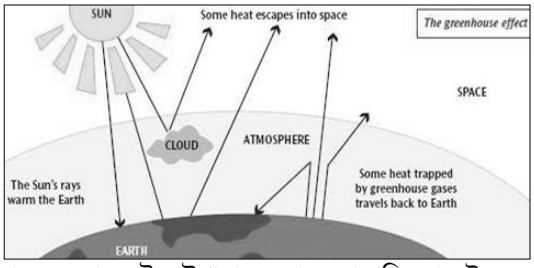

বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়। আর ভৌত উপাদানগুলোর অস্বাভাবিকতা ঘটলে জলবায়ু পরিবর্তন হয়।

ভৌত উপাদানঃ বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহ, বায়ু আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি

জলবায়ু পরিবর্তন যেসব নিয়ামকের উপর নির্ভরশীলঃ জৈব প্রক্রিয়াসমূহ, ওজনস্তর ক্ষয়, কীটনাশক ব্যবহার প্রভৃতি।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক পরিবেশে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে সেগুলো হলোঃ

জাতিসংঘের আইপিসিসি সিক্সথ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট

- **প্রকাশ করেছেঃ** IPCC
- **জাতিসংঘ মহাসচিব প্রতিবেদনটিকে অভিহিত করেনঃ** Code Red for Humanity বা মানবতার জন্য লাল সংকেত হিসেবে
- **প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছেঃ**
  - ⇨ ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে এবং ৫০ বছরের মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে ২ ডিগ্রি
  - ⇨ ২০১১-২০২০ দশকে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১৮৫০-১৯০০ সময়কাল থেকে ১.০৯ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে
  - ⇨ ১৯০১-১৯৭১ সময়কালের তুলনায় সমুদ্রের পানির স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক হার প্রায় ৩ গুণ বেড়েছে
  - ⇨ শতাব্দীর শেষে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে।
  - ⇨ ২০৫০ সালের মধ্যে অন্তত এক বছর সম্পূর্ণ বরফশূন্য হবে উত্তর মেরু অঞ্চল।

➢ জলবায়ু কূটনীতি (Climate Diplomacy) [***]

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ক্ষতিকর প্রভাব রোধকল্পে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমন্বিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে জলবায়ু কূটনীতির (Climate Diplomacy) আগমন ঘটেছে।

বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিতে জলবায়ু কূটনীতি ধারণা উদ্ভবের কারণ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য–

ক. জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলো কীভাবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে।
খ. ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ করে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করে কীভাবে দায় শোধ করবে।
গ. শিল্পোন্নত দেশগুলোর কৌশল কী হবে।
ঘ. Climate Finance নামের ব্যয়ের খাত কীভাবে নির্ধারিত হবে।

কালে কালে Climate Negotiation এর ফলঃ

ক. Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC) গঠন?
খ. Green Climate Fund গঠন?
গ. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) গঠন?
ঘ. Climate Change Regilence Fund গঠন?
ঙ. Bali Action Plan on Climate Negotiation গঠন?

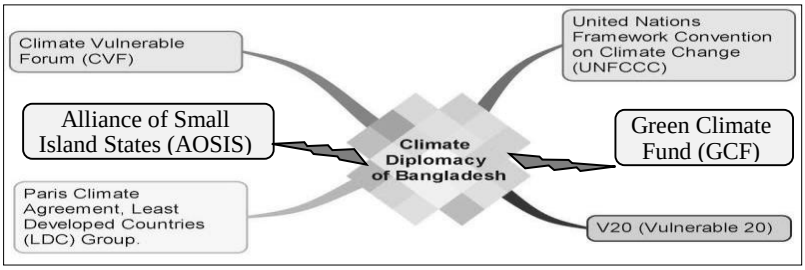

এছাড়াও জলবায়ু কূটনীতি প্রয়োগ করে জলবায়ু চুক্তি, সম্মেলন আয়োজন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হচ্ছে, যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যায়। ২০০৯ সালে 'কপ-১৫' সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠনের জন্য শিল্পোন্নত দেশের জিডিপির ০.৭% অর্থায়ণ করার সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

➢ IPCC [***]

IPCC বা Inter-governmental Panel on Climate Change হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তঃসরকারি প্যানেল। এর মূল কাজ হচ্ছে মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মূল্যায়ন করা। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের দুটি অঙ্গসংস্থা বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর উদ্যোগে গঠিত হয় IPCC.

➢ প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা।
২. মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।
৩. এ সমস্যা সমাধানে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো এবং সমস্যার কার্যকরী সমাধানের দিক নির্দেশনা প্রদান।
৪. বার্ষিক জলবায়ু প্রতিবেদন প্রকাশ।

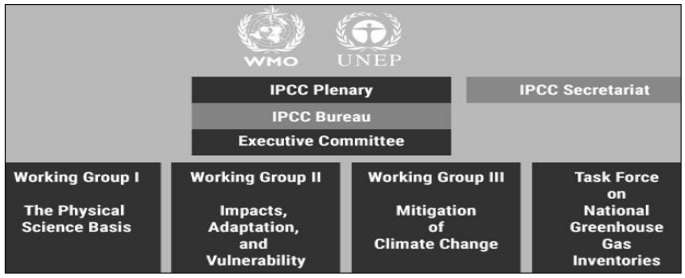

➢ Green Climate Fund [***]

Green Climate Fund একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম হিসেবে বিশ্বব্যাপী কাজ করছে। ২০০৯ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন 'কপ-১৫' এই তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ২০১০ সালে ১৯৪টি দেশের উদ্যোগে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠিত হয়। ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে ('কপ-১৭') এই তহবিল কার্যক্রম শুরু করে।

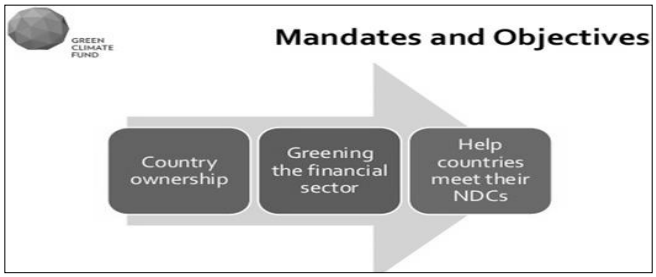

➢ কর্মসূচি:

ক. উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, সেসব সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা।
খ. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।
গ. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে, সেসব দেশের পাশে দাঁড়ানো।

➢ অর্থায়নের উৎস:

Green Climate Fund নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০২৪ সাল নাগাদ একটি লক্ষ্য স্থির করেছে, সেটি হলো ১০০ বিলিয়ন ডলার ফান্ড গঠন করা। অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন গঠন করেন "High Level Advisory Group on Climate Financing (AGF)". ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই তহবিলে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

- ⇨ ২০২৪ সাল নাগাদ ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করতে হবে।
- ⇨ জো-বাইডেন আসার পর ফান্ডে যুক্তরাষ্ট্র অর্থায়ন করেছে ২ বিলিয়ন ডলার।
- ⇨ বর্তমানে উন্নত দেশের সবাই মিলে ১০-১২ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।
- ⇨ ব্রিটেন, কানাডা, চীন, জার্মানির মতো অর্থনৈতিক পরাশক্তি এই তহবিলে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি থেকে আংশিক দিয়েছে।
- ⇨ স্বল্পোন্নত দেশের অভিযোজনে ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ১.৪ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে।
- ⇨ বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ১০০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা পেয়েছে।

➢ Green Economy [**]

সবুজ অর্থনীতি বা Green Economy বলতে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিকে বুঝায়। অর্থাৎ, পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন না করে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। সবুজ অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্তই পরিবেশের অনুকূলে থাকবে। পরিবেশের প্রতিকূলে গিয়ে কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়, এটাই সবুজ অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য। সবুজ অর্থনীতিতে সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, কার্বন নির্গমনের হার হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

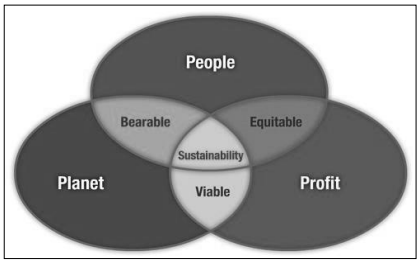

সবুজ অর্থনীতি হলো সেই অর্থনীতি যা মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে এবং সমতা আনবে, কিন্তু পরিবেশগত ঝুঁকি কমাবে এবং পরিবেশগত অভাব দূর করবে।

সবুজ অর্থনীতির উপাদান:

০১. সবুজ জ্বালানি
০২. সবুজ পুঁজি
০৩. সবুজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
০৪. সবুজ ভূমি ব্যবস্থাপনা
০৫. সবুজ পরিবহন
০৬. সবুজ কর্মসংস্থান
০৭. সবুজ পানি ব্যবস্থাপনা
০৮. সবুজ কৃষি।

➢ Green Banking

গ্রিন ব্যাংকিং হলো এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বজায় রাখা। অর্থাৎ, গ্রিন ব্যাংকিং হলো পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং।

গ্রিন ব্যাংকিং এর লক্ষ্য:

১. ব্যাংকিং কার্যক্রমে কাগজের ব্যবহার কমানো
২. পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনে আর্থিক সহায়তা প্রদান
৩. পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান
৪. অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান
৫. আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা তৈরিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

➢ অভিযোজন (Adaptation): [**]

অভিযোজন হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর যে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সে পরিস্থিতি উত্তরণে গৃহীত কৌশলকে জলবায়ু অভিযোজন বলে।

অর্থাৎ জলবায়ু অভিযোজন বলতে বুঝায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখার সক্ষমতাকে।

UN Adaptation Committee জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজনের ৩টি পর্যায় চিহ্নিত করেছেন:

১. **প্রথম পর্যায়ে,** জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করা এবং আমরা এমন কিছু করছি কিনা তা চিহ্নিত করা। এজন্য–
   ক. ঝুঁকির সম্মুখীন প্রয়াসগুলো বন্ধ করতে হবে।

খ. প্লাবন ভূমিতে ভাসমান ভবন নির্মাণ করতে হবে।
গ. জলবায়ুর ঝুঁকি কমাতে হবে।
ঘ. পানি, বায়ু ও মাটি দূষণ ঠেকাতে হবে।

২. **২য় পর্যায়ে,** আমাদের বর্তমান অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগুলোতে বিনিয়োগ করতে হবে। যেমন: সেতু, রাস্তা, বিমানবন্দর এবং নৌবন্দরগুলোর বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৩. রূপান্তরমূলক অভিযোজনের দিকে নজর দেয়া।

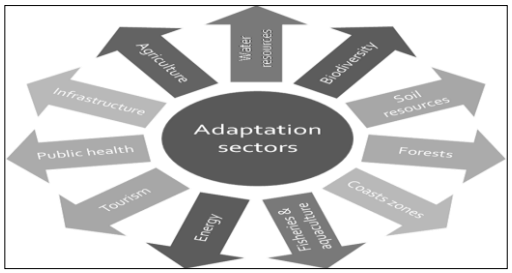

➢ **অভিযোজন কৌশলের খাতসমূহ:**

ক. পানি	খ. কৃষি	গ. অবকাঠামো	ঘ. জনস্বাস্থ্য	ঙ. যোগাযোগ
চ. শক্তি	ছ. জীববৈচিত্র্য	জ. মাটি	ঝ. বনভূমি	ঞ. পর্যটন

➢ Sustainable Development Goals [***]

১৯৮৭ সালে World Commission on Environment & Development (WCED) কর্তৃক Our Common Future শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকেই মূলত Sustainable Development শব্দটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। রিও সম্মেলনেও প্রচলিত উন্নয়নের ধারণার বিপরীতে টেকসই উন্নয়ন ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। টেকসই উন্নয়নের ধারণায় বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আগামি প্রজন্মে যাতে তাদের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা হারিয়ে না ফেলে তার নিশ্চয়তা বিধান করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রা: [***]

২০১৫ সালে জাতিসংঘের ৭০তম সম্মেলনের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ১৫ বছর মেয়াদি টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়। যা ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। লক্ষ্যমাত্রাগুলো হলো-

SDG- 01 : সর্বত্র সবধরনের দারিদ্র নির্মূল করা
SDG- 02 : ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু
SDG- 03 : স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা
SDG- 04 : অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা
SDG- 05 : লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা
SDG- 06 : সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
SDG- 07 : সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সুবিধা নিশ্চিত করা
SDG- 08 : সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা
SDG- 09 : দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা
SDG- 10 : দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা
SDG- 11 : নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা
SDG- 12 : টেকসই ভোগ উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা
SDG- 13 : জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা
SDG- 14 : টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা
SDG- 15 : পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা
SDG- 16 : টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর করা, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা
SDG- 17 : বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা

➢ Agenda-21 [***]

একবিংশ শতককে পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখার জন্য ১৯৯২ সালের রিও কনফারেন্স থেকে এজেন্ডা-২১ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের ইস্যুগুলো এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

এটি একটি ৩০০ পৃষ্ঠার দলিল। ২১ শতকের পৃথিবীকে সামনে রেখে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই নামকরণ করা হয়েছে এজেন্ডা-২১। দলিলটি বাস্তবায়নে ১২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্ধ রাখা হয়।

Note: বাংলাদেশের ফারাক্কা বাঁধ 'এজেন্ডা-২১' এর অন্তর্ভুক্ত।

সারা বিশ্বের পরিবেশ সমস্যাগুলোকে বিষয়ভিত্তিতে বিন্যস্ত করে সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে কী কী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন তার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ব্যয়ের (আনুমানিক ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতি বছর) ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে। দলিলটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত ফলপ্রসু হতে পারে। Agenda-21 বাস্তবায়নের ব্যাপারটির পরিক্ষণের জন্য পরবর্তীতে জাতিসংঘের অধীনে Commission on Sustainable Development, CSD নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। CSD এর সচিবালয় নিউইয়র্কে।

☞ UNFCCC: [**]

- **পূর্ণ নাম:** United Naitons Franework Convention on Climate Change.
- **লক্ষ্য:** বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলা
- **প্রস্তুত হয়:** ০৯ মে, ১৯৯২ নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- **স্বাক্ষর:** ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনে [রিওডিজেনেরিও, ব্রাজিলে]
- **কার্যকর:** ১৯৯৪
- **বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে:** ১৯৯২ এবং অনুমোদন করে ১৯৯৪
- **মূল কাজ:** বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন (COP) আয়োজন

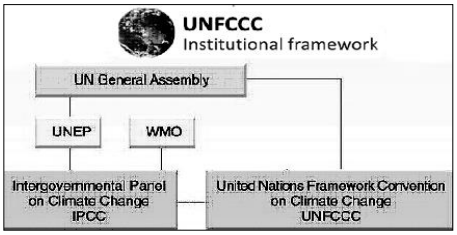

- **উদ্দেশ্য:** জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা
- **স্বাক্ষরকারী পক্ষ:** ১৯৮টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন [জাতিসংঘের সদস্য ১৯৩টি+ ফিলিস্তিন+ ভ্যাটিকান+ নিউ দ্বীপপুঞ্জ+ কুক দ্বীপপুঞ্জ+ ইউরোপীয় ইউনিয়ন]

Note: নিউ দ্বীপপুঞ্জ ও কুক দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউজিল্যান্ডের অধীন।

কপ-২৭ এর গুরুত্বপূর্ণ দিক:

২০০টি দেশের অংশগ্রহণে ২০২২ সালের ৬-১৯ নভেম্বর মিশরের শার্ম আল শেখে কপ-২৭ অনুষ্ঠিত হয়। **গুরুত্বপূর্ণ দিক–**

১. ১৯ শতকের শেষের দিকের মত তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা।
২. ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস ৪৫% হ্রাস করা।
৩. ১৩৪টি উন্নয়নশীল দেশের জন্য Loss & Damage Fund গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৪. ২০৩০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রতি বছর কমপক্ষে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা যাতে ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য নির্গমনে পৌছতে সক্ষম হওয়া যায়।
৫. "উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের উদ্বেগের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং তদসংশ্লিষ্ট ক্রমবর্ধমান ঋণ, এবং তাদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানগুলো বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সালের আগে প্রায় ৫.৮ থেকে ৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।"

➢ কার্বন কর (Carbon Tax) [**]

কার্বন কর বা কার্বন ট্যাক্স হলো জ্বালানি ব্যবহারের ফলে নির্গত কার্বনের উপর ধার্যকৃত কর বা ট্যাক্স। কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের জন্য তথা পরিবেশ দূষিত করার জন্য জ্বালানি ব্যবহারকারীকে যে ট্যাক্স দিতে হয়, প্রথাগতভাবে তাকেই কার্বন ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করা হয়। '৯০ এর দশকে ফিনল্যান্ড সর্বপ্রথম কার্বন কর চালু করে। এরপর ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়া চালু করে।

☛ কার্বন কর চালু করার উদ্দেশ্য:

- স্বল্প ব্যয়ে কার্বনের নিঃসরণের পরিমাণ কমানো
- জনগণকে কার্বন সম্পন্ন জ্বালানি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা
- গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে কর থেকে সাহায্য প্রদান করা
- বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসকরণ
- গ্রিনহাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের রক্ষা করা।
- এই কর আরোপ করা হলে দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

➢ কার্বন বাণিজ্য (Carbon Trade): [***]

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন বাস্তবতা হচ্ছে কার্বন বাণিজ্য। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড কম নিঃসরণের জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ক্রেডিট বিনিময়ের নাম কার্বন বাণিজ্য। অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণ যারা বেশি করে সে দেশগুলো অধিকতর কার্বন নিঃসরণের অধিকার লাভ করে এবং

কম কার্বন নিঃসরণকারী রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কার্বন অর্থের বিনিময়ে কিনবে। ফলে অধিক কার্বণ নিঃসরণকারী কার্বন নিঃসরণের দিকে নজর দিবে এবং কম নিঃসরণকারী আরও কম নিঃসরণ করবে।

কার্বন বাণিজ্যের সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয় ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরের পর। সক্ষমতা সত্ত্বেও যে সব কোম্পানি কম দূষণ করে, তারা তাদের অব্যবহৃত দূষণের অধিকার বেশি দূষণকারী কোম্পানির কাছে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন বা বিক্রি করে থাকে। এই প্রক্রিয়া একটি রেগুলেটরি কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে, ক্রেতা কোম্পানি বা দেশটি তার ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে কার্বন নিঃসরণ করছে কি না।
২০১৯ সালের ২৫ জানুয়ারি কার্বন বাজার সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সাল পর্যন্ত কার্বনের দাম প্রতি টন ৪০ থেকে ৮০ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি টন কার্বনের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

- **যেভাবে সূত্রপাত:**

১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকলের ১৭ অনুচ্ছেদে ৩৮টি দেশকে ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তাদের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে (১৯৯০) ৫.২% কমানোর সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। এবং বলা হয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ বিষয়ে বাণিজ্য বা যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। মূলত এখান থেকেই কার্বন ট্রেডিং এর সূত্রপাত।

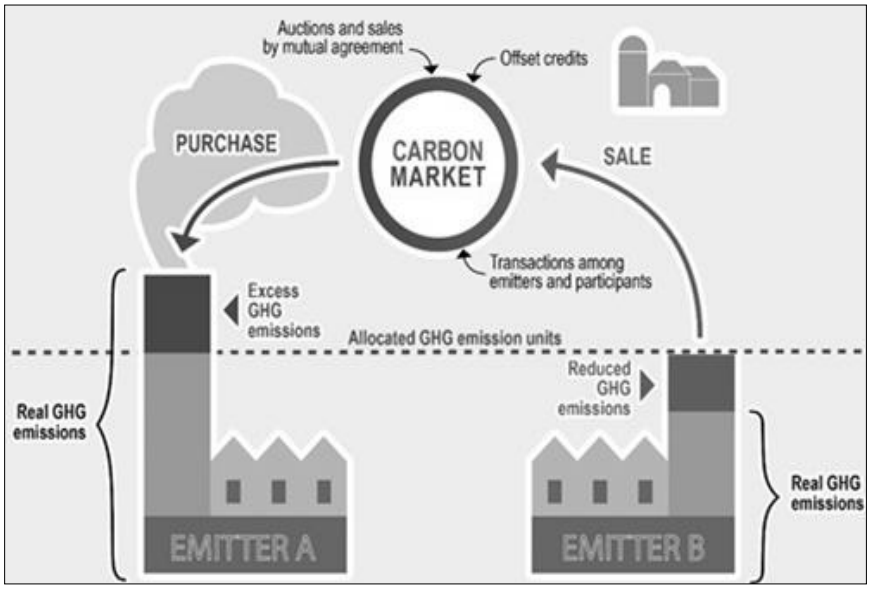

- **'কার্বন ট্রেডিং'– মুক্তি নয়, বরং ফাঁদ:**

পৃথিবীতে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর জন্য কিয়োটো প্রটোকল একটি আইনগত বাধ্যতামূলক দলিল। এই প্রটোকলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু ধনী দেশগুলো নিজেদের সুবিধার জন্য Carbon Trading নামে নতুন একটি ধারণার জন্ম দেয়। যাতে শিল্পের অগ্রগতি রোধ না হয়, আবার গ্রিনহাউজ জাতীয় গ্যাসগুলো কম নির্গত হয়।
যেহেতু কার্বন নিঃসরণ একটি সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাই যে দেশ সীমার চেয়ে কম নিঃসরণ করবে, সেই অনুপাতে তার নামে কার্বন ক্রেডিট জমা পড়বে। আর যারা সীমার চেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করবে, তারা সে ক্রেডিট কিনে নেবে। এ চুক্তির ফলে উন্নত দেশগুলো অর্থের বিনিময়ে তাদের কার্বন নিঃসরণের বৈধতা পাচ্ছে। এতে কার্বন নিঃসরণ কোনোভাবেই কমছে না বরং কার্বন ক্রেডিট কিনে উন্নত দেশসমূহ দায়মুক্তি পাচ্ছে এবং অবাধে কার্বন নিঃসরণ করে যাচ্ছে।

➢ Paris Agreement-2016: [***]

UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC-এর অধীন ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর হতে ১২ ডিসেম্বর প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন 'কপ-২১' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের সকল সদস্য দেশ (১৯৬টি দেশ) ও গোষ্ঠীর (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) ঐকমত্যের ভিত্তিতে আলোকে জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্কে ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে একটি চুক্তি গৃহীত হয় যা ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম জলবায়ু চুক্তি।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বিষয়বস্তুঃ

- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম করা।
- গাছ, মাটি ও সমুদ্র প্রাকৃতিকভাবে যতটা শোষণ করতে পারে, ২০৫০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে কৃত্রিমভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ সেই পর্যায়ে নামিয়ে আনা।
- প্রতি ৫ বছর অন্তর ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ রোধে প্রত্যেকটি দেশের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে গরিব দেশগুলোকে ধনী দেশগুলোর জলবায়ু তহবিল দিয়ে সাহায্য করা।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা করা।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় ২০২০ সালের মধ্যে ১০০ বি. ডলার অর্থায়নের অঙ্গীকার।
- যুক্তরাষ্ট্র তার গ্রিনহাউজ গ্যাস ২০২৫ সালের মধ্যে ২৬-২৮ শতাংশ কমিয়ে আনবে।
- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে আনা ও কয়লার বিকল্প উৎসে জোর দেওয়া।

প্যারিস চুক্তির দুর্বলতাঃ

- বিশ্বের সকল সদস্যদেশকে বিশেষ করে শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশসমূহকে এই চুক্তির বাধ্যবাধকতায় আনার জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে। যেমন– দেশসমূহ কর্তৃক মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, আর্থিক অন্যান্য সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।
- বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা স্ব স্ব দেশ কর্তৃক নির্ধারিত হবে, যা পাঁচ বছর পর পর Nationally Determined Contribution এর মাধ্যমে কনভেনশন সচিবালয়ে দাখিল করা হবে এবং তার উপরই বিশ্ব সম্প্রদায়কে নির্ভর করতে হবে। মনিটরিং ত্রুটি।
- উন্নতদেশের প্রবল আপত্তির মুখে Loss & Damage সংক্রান্ত Liablity and Compensation অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
- কোনো দেশ কার্বন নিঃসরণ কমাতে ব্যর্থ হলে তার জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়নি চুক্তিতে।

➢ Carbon Credit [***]

কার্বন ক্রেডিট বলতে সেই ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে একটি দেশ বা প্রতিষ্ঠান কী পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গত করার অনুমতি পায় তা নির্ধারণ করা হয়। একটি ক্রেডিট ১ টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমান ভর নির্গমনের অনুমতি দেয়। কার্বন ক্রেডিটের লক্ষ্য হলো কার্বন-ডাইঅক্সাইডের নির্গমন হ্রাস করা, যাতে শিল্প কর্মকান্ডের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়নের সাপেক্ষে পরিবেশকে সহায়তা করা যায়।

নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কোম্পানিগুলোর জন্য নির্গমনের একটি সীমা নির্ধারণ করে। কার্বন ক্রেডিট ব্যক্তিগত এবং সরকারি মাধ্যমে লেনদেন করা হয়। কার্বন ক্রেডিট ২ প্রকার: ১. স্বেচ্ছায় নির্গমন হ্রাস (VER) ২. প্রত্যয়িত নির্গমন হ্রাস (CER)

➢ পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি (Green Hydrogen) [*]

'গ্রিন হইড্রোজেন' নামক নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে মধ্যপ্রাচ্য। এই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অপরিশোধিত তেল বা গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে জলবায়ুবান্ধব জ্বালানি তৈরি করা যাবে।
গ্রিন হাইড্রোজেন প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পানি থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা হয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় বায়ু বিদ্যুৎ, সৌর বিদ্যুৎ ও পানি বিদ্যুৎ। সবুজ হাইড্রোজেন প্রযুক্তির ফলে কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।

- ➲ সবুজ হাইড্রোজেন প্রযুক্তিতে ৮৪০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে সৌদি আরব। লোহিত সাগরের তীরবর্তী কেন্দ্রটি চালু হতে পারে ২০২৬ সালে। ২০২৬ সাল নাগাদ এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ৬০০ টন হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে।
- ➲ ২০৩১ সাল নাগাদ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি হাইড্রোজেন উৎপাদনকারী ১০ দেশের মধ্যে থাকতে চায় সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- ➲ ২০২৩ সাল নাগাদ ১০ লাখ টন হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে চায় ওমান।

বৈশ্বিক হাইড্রোজেন বাজারে নিজেদের সুসংহত করতে ও জীবশ্ম জ্বালানির বাজার ধরে রাখার চেষ্টা করছে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো।

➢ পানি সংকট (Water Crisis)

World Resources Institute (WRI) এর নতুন প্রতিবেদন বলা হয়েছে–

১. বিশ্বের ২৫ শতাংশ মানুষ চরম পানি সংকটের মধ্যে রয়েছে।
২. ২০৬০ সালের তুলনায় বর্তমান পানির চাহিদা দ্বিগুণ হয়েছে।
৩. ২০৫০ সাল নাগাদ নতুন করে ১০০ কোটি মানুষ পানির সংকটে পড়বে।
৪. যে ২৫ শতাংশ মানুষ চরম পানিরকষ্টে ভুগছেন তাদের বসবাস মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার ২৫টি দেশে।
৫. সবচেয়ে বেশি পানির সংকটে থাকা ৫টি দেশ হল– বাহরাইন, সাইপ্রাস, কুয়েত, লেবানন ও ওমান।

➢ Loss & Damage Fund (LDF) [***]

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ধনী দেশগুলোর তহবিল। এই তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ২০২২ সালের ২৭তম কপ সম্মেলনে। যেসব ঝুঁকি মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান করা হবে–

i. ক্রমবর্ধমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ii. চরম তাপ প্রবাহ
iii. মরুকরণ iv. বনের আগুন v. ফসল অনুৎপাদন

কি পরিমাণ অর্থ সহায়তা দেয়া হবে এবং তহবিলের অর্থ কোথা থেকে আসবে সে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে– কপ-২৮ সম্মেলনে।

➢ প্লাস্টিক দূষণ (Plastic Pollution)

২০২৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়–

'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ-প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে, শামিল হই সকলে'।

এবারের এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। কারণ আধুনিক বিশ্বে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে প্লাস্টিক দূষণ।

প্লাস্টিক হচ্ছে কৃত্রিমভাবে তৈরি পলিমার, যা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে রাসায়নিক উপায়ে তৈরি যেকোনো দ্রব্যের চেয়ে সস্তা, ব্যবহারবান্ধব এবং দীর্ঘস্থায়ী। ফলে বিদ্যুৎগতিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং অবচেতন মনেই আমরা জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সবকিছুকে প্লাস্টিক দূষণে দূষিত করে ফেলছি।

প্লাস্টিক যেভাবে পরিবেশ দূষণ করে ও ক্ষতিসাধন করে

১. প্লাস্টিক দূষণ ইকোসিস্টেমের জন্য এক ভয়ঙ্কর বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে বিপন্ন করে তুলেছে মানুষ ও অন্যান্য জীবের অস্তিত্বকে।

২. পরিবেশে অপচনশীল প্লাস্টিক বর্জ্যের সঙ্গে অতিবেগুনি রশ্মি এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মিথস্ক্রিয়ার ফলে মাইক্রো ও ন্যানো প্লাস্টিকের কণা এবং নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশে নির্গত হয়।

৩. বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত ৫০ বছরে পুরো বিশ্বে মাথাপিছু এক টনের বেশি প্লাস্টিকের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। যার ৯০ শতাংশের বেশি পৃথিবীর পরিবেশকে নানাভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। এসব ক্ষতিকর পচনরোধী বর্জ্য পরিবেশে ৪০০ থেকে ১ হাজার বছর পর্যন্ত থাকতে পারে।

৪. দীর্ঘদিন প্রকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় থেকে মাটিতে সূর্যের আলো, পানি এবং অন্যান্য উপাদান প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে, উপকারী ব্যাকটেরিয়া বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করে।

৫. প্লাস্টিক দূষণের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে সামুদ্রিক প্রতিবেশ। এর ফলে প্রতিবছর ১০ লাখ সামুদ্রিক পাখি এবং ১ লাখ সামুদ্রিক প্রাণী মৃত্যুবরণ করে। সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছের শরীরে 'মাইক্রোপ্লাস্টিক' সঞ্চিত হয়ে তা খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে।

➢ Global Biofuel Alliance (GBA) [***]

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা কমিয়ে জৈব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স বা বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোট গঠিত হয়। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ২০২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ জোট গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ভারত আন্তর্জাতিক জৈব জ্বালানী জোট বা GBA গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

জোটের সদস্য:

জৈব জ্বালানি জোটের মূল উদ্যোক্তা ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল। প্রাথমিকভাবে এই ০৩ দেশ মিলে জোট গঠন করে। আর্জেন্টিনা, কানাডা, বাংলাদেশ, ইতালি, মরিশাস, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মোট ১৯টি দেশ সম্মতি জানিয়েছে এই জোটে যোগ দিতে।

World Bank, Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), International Energy Agency, International Energy Forum, International Renewable Energy Agency, International Civil Aviation Organization সহ মোট ১২টি বৈশ্বিক সংগঠন বা সংস্থা এই জোটের উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

জোটের লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা:

১. বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়া এবং দূষণের জেরে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই জোটের লক্ষ্য হবে জৈব জ্বালানি সরবরাহ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে জৈব জ্বালানি খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে একে অপরকে সাহায্য করা।

২. এ জোটের প্রাথমিক লক্ষ্য পেট্রলের সঙ্গে ২০ শতাংশ 'ইথানল' মেশানো। এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমবে। তাতে দূষণের মাত্রাও কমবে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় কিছুটা সহায়ক হবে।

৩. জৈব জ্বালানি ব্যবহারের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রযুক্তির আদানপ্রদান করবে GBA অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো।

৪. জৈব জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি, প্রয়োগের কৌশল, মান নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলি সুনির্দিষ্ট করতে উদ্যোগ নেবে জিবিএ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে জোটের গুরুত্ব:

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সারা পৃথিবীতেই জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে জৈব জ্বালানির। এ প্রেক্ষাপটে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প উৎস তৈরিতে যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। ইথানল তৈরি হয় প্রকৃতিবান্ধব শস্য আখ থেকে। পেট্রল, ডিজেল কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে এই ইথানল যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে। সদস্যদেশগুলো আখ উৎপাদন বাড়িয়ে সেই পরিবর্তনে সহায়ক হতে পারবে। ভারত বা বাংলাদেশের মতো দেশের অর্থনীতির জন্য এই জোটবদ্ধতা আরও জরুরি, কারণ শক্তি পেতে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা এসব দেশে দিন দিন বেড়ে চলেছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দূষণের মোকাবিলার পাশাপাশি কৃষকদের রোজগারও বাড়বে ।

International Energy Agency (IEA) অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে Zero Emission লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে জৈব জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার ২০৩০ সালের মধ্যে ০৩ গুণ বাড়াতে হবে। কাজেই সেই লক্ষ্য পূরণে এ জোট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল জৈব জীবাশ্মের সবচেয়ে বেশি উৎপাদনকারী দেশ। পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পৃথিবী গড়তে জৈব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতেই হবে। জৈব জ্বালানি গ্রিনহাউস গ্যাস কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করার একটি টেকসই কৌশলগত সমাধান দেয়। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই ও সুরক্ষিত জ্বালানি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিই হবে জৈব জ্বালানি।